ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

ঋণ অথবা অনুকরণ — অধমর্ণদের কথা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, "... কাব্য কবির পূর্বপুরুষ, কবি কাব্যের জন্মদাতা নন"। কবিতার নৃতাত্ত্বিক ঠিকুজি অনুসন্ধান করতে গিয়েই এ কথা তিনি বলেছিলেন। এ কথা ভিন্নার্থেও প্রযোজ্য। কাব্য এই অর্থে পূর্বপুরুষ যে কবিতাই কবির অন্তরে জাগিয়ে তোলে কবিতাগ্নি। পূর্বজ কবিতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুজ কবিতার উৎসসূত্র ; যদিও উৎসসূত্র তবু তা জনক নয়, জননী নয়, জরায়ু নয়, নয় ধাত্রী। কবিতাই কবিতার জন্ম দেবে তা হতে পারে না ; কবিতা কবিকে আলোড়িত করে, তাঁর বোধ ও কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, কবিতা কবিকে অনুপ্রাণিত করে। অনুপ্রাণিত করে বটে, কিন্তু এই অনুপ্রেরণার স্বরূপ কী হবে, কী হবে তার বহিঃপ্রকাশ, তা নির্ভর করে কবিরই ওপর। সচেতনভাবেই হোক আর অচেতনভাবেই হোক, কবিই নির্ধারণ করবেন কতটুকু তিনি নেবেন পূর্বজ কবিতার কাছ থেকে, আর কতটুকু যোগ করবেন তিনি। কবিই নির্ধারণ করবেন বটে, কিন্তু এই গ্রহণ-বর্জনের বিষয়টি নির্ভর করে তার ক্ষমতা-অক্ষমতা, সততা-অসততার ইত্যাদি নিয়ামকের ওপর।

কবি অনুপ্রেরণা পেতে পারেন নানা উৎস থেকে। একটি অভিনব ঘটনা, একটি নৈসর্গিক দৃশ্য, এমনকি একটি চিত্র কিংবা অর্থবহুল একটি শব্দমাত্রও কবির হৃদয় মন্থন করে কবিতার ভ্রূণ তৈরি ক'রে দিতে পারে। কিন্তু যাকে আমরা বলি "ভালো" কবিতা— প্রতিপত্তিতে যা অন্য সকলের চেয়ে ধনী— প্রভাবান্বিত করবার ক্ষমতাও তার সর্বাধিক। সে অভিভূত করেই ক্ষান্ত হয় না, পাঠক-কবির হাতে সে পুনর্জন্ম লাভ করতে চায়। এখানে বিপত্তির সূত্রপাত ঘটে যেতে পারে। কুম্ভীলকবৃত্তি, অনুকরণ বা উৎকট প্রভাবের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে। ঘটে যেতে পারে— কিন্তু সকল সময় তা ঘটে না। একজন শুদ্ধ কবি ভালো কবিতা থেকে তীব্র প্রেরণাই সংগ্রহ করেন। শুদ্ধ কবির কলমে অনুপ্রেরণা সহজে প্রভাবে রূপান্তরিত হয় না; তবে কখনো তা হয়ে যেতে পারে। হয়ে যায়। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "... প্রত্যক্ষ প্রভাব ভাবগত, মনের গভীরতম স্তরে যার ক্রিয়াকলাপ। সেই কবিরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে পড়ি আমরা, যাকে আমরা অনুভব করি একান্ত বলে, চিনতে পারি পরিচালক ও প্রতিযোগী বলে।" এজরা পাউন্ড, বোদল্যের, র‍্যাঁবো, হোল্ডলিন, রিলকে অন্তত: এই পাঁচজন অসামান্য কবিকে বুদ্ধদেব বসু পরিচালক ও প্রতিযোগী বিবেচনা করেছিলেন।

অনুপ্রাণিত কবি সজ্ঞানে অনুকরণে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন;— আত্মসাৎ নয় — আত্মস্থ ক'রে একটি কবিতা থেকে আরেকটি ভালো কবিতার জন্ম দিতে পারেন। যে সকল কবির মধ্যে আছে অভিন্ন মানসিক সত্তা, যা কিনা দুর্লভ, তাদের মধ্যে হতে পারে ভাব ও উপলব্ধির আদান-প্রদান। কিন্তু এর সমীকরণটি এরূপ হতে হবে যেন নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা বজায় লুপ্ত হয়ে না যায়। এক্ষেত্রে একের সৃষ্টি আরেকের নির্মাণে ঘটকের দায়িত্বটুকুই সাফল্যের সাথে পালন করে যাবে।

তবে কি অনুপ্রেরণার পদাংকেই রচিত হবে কবিতার এ প্রতিকৃতি? হতে পারে — কিন্তু সচরাচর নয় কারণ কাব্য স্বয়ম্ভু। কবিতা স্বতঃপ্রবৃত্ত, কবি স্বতঃপ্রবৃত্ত নন। কেননা কবিতার তিন মৌলিক উপাদান ভাব, ভাষা ও ছন্দের মধ্যে প্রথমে অঙ্কুরিত হয় ভাব। কবির কাজ প্রথমত ভাষা ও ছন্দে এই অঙ্কুরকে অবয়ব প্রদান করা। এজন্য তিনি কবিতার বীজ অনুসন্ধান করেন সর্বত্র, যার মধ্যে পূর্বজ কবিতা অন্যতম। স্মরণীয়, "কাব্যের মুক্তি" প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আরো বলেছেন, "কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে, এবং কবি যদি মহাকালের প্রসাদ চায়, তবে শুচিবায়ু তার অবশ্য বর্জনীয়,... "। এই পরামর্শের অর্থ স্বচ্ছ করবার দরকার আছে। অন্যের কবিতা নিজের নামে চালিয়ে দেয়ার ঘটনা বিরল, কিন্তু এহেন চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিতেও দু'একজনের বুক কাঁপে না। সুধীন দত্ত নিশ্চয়ই এই জাতীয় পরিগ্রহণ বা ঋণের কথা বলেননি। তিনি সেই পরিগ্রহণের কথা বলেছেন যা অনুকরণ বা অনুসরণের পর্যায়ে পড়ে না। মধুসূদন দত্তের কথা স্মরণ করা যাক। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁরই অবদান। ইয়োরোপীয় কাব্য থেকেই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শেকসপীয়র তাঁর সনেটের জন্য পেত্রার্কের কাছে ঋণ স্বীকার করুন বা না-করুন তাতে কিছু যায় আসে না;— গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইংরেজী সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে তাঁর রচিত সনেটগুচ্ছের অবদান তুলনারহিত ।

সাহিত্যে কেবল কাঠামোর ক্ষেত্রে পরিগ্রহণ বিষয়টি জটিলতামুক্ত। কথাসাহিত্যে প্রায়শ কাহিনী অধিগ্রহণের অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। ড্যান ব্রাউনের *দি দা ভিঞ্চি কৌড* রহস্যোপন্যাসটির বিরুদ্ধে এহেন একটি অভিযোগ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে রহস্যোপন্যাস লিখিত হতে পারে। ইতিহাসের ভিত্তিতে লিখিত হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে কোনো-না-কোনো ইতিহাসগ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু ইতিহাসের 'কপিরাইট' করবার প্রশ্নটি অবান্তর। অন্যদিকে কবিতার ক্ষেত্রে পরিগ্রহণের বিষয়টি জটিল হয়ে দাঁড়ায়, যখন একটি কবিতার ভিত্তিভাবনা (Theme) আরেকজন কবি ব্যবহার ক'রে ফেলেন। কবিতার যে আলংকারিক কাঠামো, তার অন্তরে থাকে কবির আবেগোত্থিত কোনো ভাবনা বা উপলব্ধি। এই ভাবনা বা উপলব্ধি হাতিয়ে নেয়াকে কি পরিগ্রহণ বলা যায়? অন্যের উপলব্ধিতে আলোড়িত হলেই কি তা ব্যবহার করা অননুমোদনযোগ্য হতে পারে? বুদ্ধদেব বসু দু'জন কবির উপলব্ধির ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কার্যত এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়।

কবিতার ক্ষেত্রে পরিগ্রহণের দ্বিতীয় জটিলতা দেখা দেয় শব্দ ব্যবহার থেকে। অভিধানভুক্ত শব্দ কারোরই অগম্য নয়। তবু কোনো কবিতায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে একটি শব্দ বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে। হয়ত সকল কবির হাতে এই কাজটি হয়ে ওঠে না, কিন্তু কোনো-কোনো কবি শব্দকে অধিগত করেন এমনভাবে, যার অনুকৃতি দৃষ্টিকটু উদাহরণ সৃষ্টি করে। গল্প বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে পাদটীকা দিয়ে স্বীকার করা সম্ভব আখ্যানভাগের উৎস কী। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক নয়— কেননা কবির কাজ অভিধানের শব্দকে কবিতার অবয়বে পুনর্গঠন করা। বলা যায়, তার আভিধানিক অর্থে নতুন মাত্রা ও ব্যঞ্জনা যোগ করা। এখানেই তার সার্থকতা। কবি মূলত শব্দশিল্পী। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রমার্জনার বিষয়টিও সহজ নয়। শব্দ-ব্যবহার প্রসঙ্গে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের বিষয়গুলো চলে আসে। কিন্তু বলাবাহুল্য এগুলো শব্দেরই বিবিধরূপ প্রয়োগমাত্র। এসব নিয়ে পৃথক আলোচনার অবকাশ আছে— যা আপাতত স্থগিত রাখা চলে। তবে অন্তত: একথা বলে রাখা দরকার শব্দচয়নের ক্ষেত্রে দেশী কবিতার প্রভাব যত সহজে দৃষ্টিগোচর হয় তত সহজে বিদেশী কবিতার প্রভাব চিহ্নিত করা যায় না।

গত পঞ্চাশ বছরে আমরা লক্ষ্য করেছি জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে বেশি পাঠক বন্দনা লাভ করেছেন। তার অতুলনীয় কবিত্বশক্তি প্রায় সকল পর্যায়ে স্বীকৃত হয়েছে। একইসঙ্গে তাঁর ওপর পাশ্চাত্যের কয়েকজন কবির প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। আক্ষরিক সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু তাকে কুম্ভীলকবৃত্তি, অনুসরণ বা অনুকরণের অভিযোগে দায়ী করা হয়নি। সুনির্দিষ্ট প্রভাব ও অনুকরণের সন্দেহোর্দ্ধ উদাহরণ সত্ত্বেও অভিযোগের আকারে বিষয়টিকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়নি। এ কাউন্টারইনটুইটিভ বিষয়টি পর্যালোচনার বিষয়। সে কি কেবল অন্য কেউ না হয়ে জীবনানন্দ ব্যক্তিটি পাঠকপ্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ বলে? এ সূত্রে স্মরণ

করি, অল্প পরিচিত কবি ম্যাডিসন কয়িনের The Waste Land কাব্যটিই ছিল টি, এস, এলিয়টের The Wasteland-এর মূল ভিত্তিপ্রস্তর। তথাপি অভিযোগের সুরে এ বিষয়টি কদাচিত উত্থাপন করা হয়।

১৯৩০-এর দশকে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার গোড়াপত্তন করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে। উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য এঁদের হাতেই নতুন দিগন্তের দেখা পেয়েছিল। এঁরা ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক। উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় কবিতায় আধুনিকতার উন্মেষ এঁদের নিবিড়ভাবে প্রলুব্ধ করেছিল। ফলে জন্মলগ্নেই আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় কাব্যের ছায়াপাত ঘটেছিল। কিন্তু এরা কেউ পরজীবী (parasite) ছিলেন না। পরজীবিতার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়নি কখনো। এদের মৌলিকতার অভাব ছিল না। আবার ইয়োরোপীয় কাব্যের কাছে তাঁদের যে ঋণ তা উপেক্ষণীয়ও নয়। এই ঋণের প্রকৃতি ও পরিমাপ সকল কবি যশোঃপ্রার্থীর জন্যই দিকনির্দেশনামূলক।

জীবনানন্দ দাশের প্রথম দিককার কবিতায়, বিশেষ করে "ঝরাপালক"-এর কিছু কবিতায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাবের কথা বহু আগেই সমালোচকবৃন্দ উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধিকতর আলোচনা অনাবশ্যক। বরং 'বনলতা সেন'-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। সচরাচর এডগার এলান পো'র "To Helen" কবিতাটির সঙ্গে এই কবিতাটির সমিলতা অনুসন্ধান করা হয়। কিন্তু একথা তো দৃষ্টি এড়ানোর মতো নয় যে "To Helen" মূলত একটি প্রেমের কবিতা আর অন্যদিকে 'বনলতা সেন' রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন হলেও প্রেম এর মর্মবস্তু নয়। এ কবিতার গন্তব্য পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবার দিকে ধাবিত। দীর্ঘকাল পরিব্যাপ্ত এই অস্তিত্ব মানুষকে ক্লান্ত ক'রে দিয়েছে। এই ক্লান্তিকর অস্তিত্বের মধ্যে 'বনলতা সেন'-এর স্মৃতি ব্যতিক্রমী অবকাশের মতো। শিবনারায়ণ রায় বলেছিলেন, "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে" একথাটি জীবনানন্দের আগে এমন করে, এমন ধ্বনিময়তায়, এত গভীর ব্যঞ্জনায় সারা বিশ্বের কোথাও কখনো কারো কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নি। ইয়েটস-এর Though I am old with wandering / Through hollow lands and hilly lands পংক্তি দুটি তিনি কিন্তু বিস্মৃত হন নি।

আইরিশ কবি ইয়েটস-এর পাঠক সম্যক অবহিত যে তাঁর "The Cat and the Moon"-এর ঘনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি জীবনানন্দ দাশের 'বেড়াল' কবিতাটি। উপরন্তু তাঁর "The Scholars"–এর অনুকরণেই রচিত জীবনানন্দ দাশ 'সমারূঢ়'। 'হায় চিল' কবিতাটিও "He Reproves the Curlew"–এর যমজপ্রতীম ;— যমজপ্রতীম, কিন্তু তারা যমজ আদৌ নয়, কেননা একটির পাঠ অন্যটির আস্বাদনকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে না। এই কথাটি মনে রাখা দরকার। ইয়েটস লিখেছেন: Oh curlew, cry no more in the air। আর জীবনানন্দের কবিতায় আমরা পড়ি : হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে / তুমি আর কেঁদো নাক উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে !

ইয়েটস লিখেছেন: Becasue your crying brings to my mind/ Passion dimmed eyes। জীবনানন্দের মনে হয়েছে: তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তাঁর ম্লান চোখ মনে আসে।

ইয়েটস লিখেছেন: There is enough evil in the crying of the wind।

জীবনানন্দ লিখেছেন: কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?

"বিড়াল", "সমারূঢ়" ও "হায় চিল" কবিতাত্রয়ে জীবনানন্দ কেন নিজেকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এ প্রশ্নের সদুত্তর একটিই : আর তা হলো অধমর্ণের ভূমিকা নিয়ে উত্তমর্ণকে অতিক্রম করে যাওয়া।

ঋণ বা অনুকরণের আলোচনায় জীবনানন্দ প্রসঙ্গ সমস্যাবহুল। কেননা তিনি যাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ইয়েটস, এলিয়ট বা বোদল্যের— এঁদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সাযুজ্য গাঢ়, ছিল জীবনোপলব্ধির নিবিড় স্বরসংগতিও। ফলে অগ্রজ কবিতার পাঠ তাঁর অন্তরে যে সুরটির অনুরণন তুলেছে, তা একান্তভাবেই নিজস্ব। জীবনানন্দ এই অনুরণনকে প্রকাশ করেছেন স্বকীয়তার মধ্য দিয়ে। স্পষ্ট ঋণ সত্ত্বেও তাঁকে অনুকারক হিসেবে অভিযুক্ত করা হয় না। তিনি সচেতনভাবেই এই ঋণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিনিময়ে যা তিনি দিয়েছেন তা মনন ও বোধে, ভাষা ও ছন্দে, উপমা ও চিত্রকল্পে এতই নিজস্ব যে দুজনের ঐকতান বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বাহুল্য বিবেচিত। তবে এর আলোচনা কৌতূহলোদ্দীপক এবং শিক্ষণীয়। কেননা জীবনানন্দ সার্থকভাবে উদাহরণ স্থাপন করেছেন যে, কীভাবে অগ্রজ কবিতার অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি হতে পারে সমোত্তীর্ণ নতুন কবিতা। কমবেশি মাত্র ১৪-১৫টি কবিতায় জীবনানন্দ ঋণের অভিজ্ঞান রেখে যাবার ব্যাপারে স্বীয় সম্মতি আদায় করতে পেরেছিলেন। তাঁর আরো আট শতাধিক কবিতা রয়েছে, যার হাতে গোনা কয়েকটিতে ইতস্তত সাদৃশ্য চোখে পড়ে মাত্র। কার্যত: ইয়েটস বা বোদল্যেরের সঙ্গে আনুরূপ্যের চেয়ে সমরূপতাই সচরাচর দৃষ্টিগ্রাহ্য।

সকলেরই জানা, বোদল্যের কেবল জীবনানন্দকে নয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু প্রভাবিত হয়েছেন আরো নিবিড়ভাবে। কিন্তু এই প্রভাবের পার্থক্য লক্ষণীয়। জীবনানন্দ বোদল্যেরকে আত্মস্থ করেছেন স্বীয় কবিসত্তায়। সুতরাং তাঁর কবিতায় বোদল্যেরের প্রভাব সেরকম, যেরকম বনের পরিচয়ে বৃক্ষ তার নিজ পরিচয় হারিয়ে ফেলে। এখানেই জীবনানন্দের শিক্ষা। অনুকরণ যদি আদৌ মানায় তবে তাকেই মানায় যার মৌলিকতার ঘাটতি নেই কোনো।

কবির প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি জুড়ে দেবেন চিন্তা। অন্যান্য কবিতার অবগাহনে তিনি ঋদ্ধ হবেন, নানা উৎস থেকে সংগ্রহ করবেন প্রেরণা। এর সবই বৈধ। কিন্তু তাঁকে অনুকরণের পথটি সযত্নে চিহ্নিত ক'রে সদাসতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। কেননা সর্বপ্রথম তাকে নিজস্ব স্বরটি আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাকে সৎ থাকতে হবে নিজের ও কবিতার কাছে। প্রেরণালাভ তথা ইতিবাচক প্রভাব আর অনুকরণের সীমানা সম্পর্কে তাকে থাকতে হবে সচেতন। তিনি পরিগ্রহণ করবেন, তবে রিসাইকেল বা পুনর্বয়ন করবেন না। অগ্রজ কবিতার ঋণ পরিশোধ করবেন তিনি কবিতার নতুনতর দিগন্ত উন্মোচনের মাধ্যমে। সে না করতে পারলে চিরঅধমর্ণ হয়েই সাঙ্গ করতে হবে তার কবিতা-কবিতা খেলা।